Prantik Gabeshana Patrika ISSN 2583-6706 (Online)
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
Volume-3 Issue-1 July 2024

মহাশ্বেতা দেবীর ছোটোগল্পে পুরাণ

শ্রেয়া তালুকদার

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2024/07/10_Shreya-Talukdar.pdf

সারসংক্ষেপ: বাংলা সাহিত্যে মহাশ্বেতা দেবী অন্যতম কথাকার। ছোটোগল্পে তিনি সমসময়ের নিপীড়িত, বঞ্চিত মানুষদের জীবনদর্শন বাণীবদ্ধ করে পাঠক সমাজকে সচকিত করেছেন। ব্যক্তিজীবনের হতাশা কাটিয়ে প্রান্তিক মানুষের 'মা' হয়ে উঠে তাঁদের জীবনী সাহিত্যকে অস্ত্র করে বিচরণ করেছেন। রোমান্টিকতার মোড়কে নিজেকে না মুড়িয়ে মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইকে মূলমন্ত্র করে জীবনের শেষদিন অবধি লিখেছেন। প্রতিবাদী লেখিকা ছোটোগল্পের বিষয়বস্তু নির্বাচনে পুরাণের নবরূপায়ণ ঘটিয়ে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

সূচক শব্দ: ছোটোগল্প, আটপৌরে, নবরূপায়ণ

সমকালীন আটপৌরে মানসিকতার রুদ্ধদ্বার উন্মোচন করে যিনি সমাজের একটি বিশেষ অংশকে কৃপণ আলোর অন্তঃপুর থেকে পৌঁছে দিয়েছেন জীবন আলোর উজ্জ্বল সজীবতায় তিনিই মহাশ্বেতা দেবী। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ, যেমন সাহিত্যিক তেমনি মানবাধিকার কর্মী বিশেষ, আর তা হয়ে উঠতে যে ধরনের প্রজ্ঞা পরিণত বোধ থাকা প্রয়োজন তা স্পষ্টত তাঁর মধ্যে ফুটে উঠেছিল। মহাশ্বেতা দেবী সাহিত্যকর্মে মানবতাকে শিল্পের উচ্চপদে জায়গা করে দিয়েছেন। তাই ইতিহাসের কাছে সাহিত্যের দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করে সমাজের অবহেলিত মানুষদের মূল স্রোতে ফিরিয়ে এনেছেন সাহিত্যশৈলির মধ্যে দিয়ে। সাহিত্য ইতিহাস নয় কিন্তু তাতে ইতিহাস থাকে। লেখিকা রোমান্টিকতার মোড়কে নিজেকে না মুড়িয়ে খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইকে মূলমন্ত্রের ধারক ও বাহক করে জীবনের শেষদিন অবধি লিখে গেছেন। তাঁর ছোটোগল্প রচনায় বহুমাত্রিকতায় এসেছে দেশজ অ্যাখান যা সৃষ্টি হয়েছে ব্যতিক্রমী জনপদের রক্তমাংসের সাহিত্যে, পরবর্তী সময়ে শুধু জনগোষ্ঠী সাহিত্য হয়ে থাকেনি তা হয়ে উঠেছে জনপদের জীবন ইতিহাস। কথাসাহিত্যে তাঁর বিচরণ ক্ষেত্র অবাধ; তিনি সৃষ্টিতে বঞ্চিত, শোষিতদের রিক্ত আকুতি যেমন দাঁত নখ-সহ চিত্রিত করেছেন ঠিক তেমনি সেই কঠিন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পথও দেখিয়েছেন। আর তার জন্য তিনি কখনো কখনো পুরাণের দ্বারস্থ হয়েছেন।

মিথ বা পুরাণ ভারতীয় শিল্প, সংস্কৃতি, সভ্যতার সমার্থক। মিথ হলো আদিম মানুষের মৌখিকভাবে প্রচলিত হয়ে আসা কাহিনি যা সময়ের সঙ্গে বিবর্তিত হতে হতে আবর্তিত হয়েছে যা একটি জাতি বা শ্রেণির স্বসৃষ্ট কাহিনি। সৃষ্টির আদিম লগ্নের জন্ম, মৃত্যু, ধবংস সম্পর্কে মানুষের জানবার তীব্র আগ্রহকে জাগিয়ে তোলে মিথ। মিথ একটি জাতির দর্পণ যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে শ্রেণিবদ্ধ জাতির কাঠামো। 'পুরাণ' শব্দের অর্থ 'পুরনো কাহিনি', কাহিনি বলেই তাতে প্রাচীন রাজ-রাজার জীবন, যুদ্ধ-বিগ্রহের ঘটনা, দেবতা-ঋষিদের চরিত্রের উল্লেখ রয়েছে। মিথ বহমান সহস্র বছরের জীবন প্রবাহ, ঋদ্ধ, প্রজ্ঞা ধারণ করে চলেছে। তৎকালীন সময়ে মানুষের লড়াইয়ের ঘটনা পরবর্তী প্রজন্মে ছড়িয়ে দিতে মিথ বা পুরাণের মতো গল্পকথার সৃষ্টি হয়েছে। মিথ হলো বর্তমানে দাঁড়িয়ে অতীতকে ছুঁয়ে দেখার প্রয়াস। মিথ বা পুরাণ সমার্থক নয় তত্ত্ববিদেরা ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য এদেরকে পারস্পরিক প্রতিশব্দ বলে ধরে নিয়েছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরাণকে অলৌকিক রূপকথা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, কিন্তু পুরাণ কোনো অলীক ভাবনা সম্পর্কিত বিষয় নয়, তাতে দৈব ঘটনার মধ্যে একটি জীবনচর্চা ফুটে ওঠে। দৃশ্যমান জগতের বাইরে যেসব অনুসঙ্গ বিদ্যমান তাদের রূপক হিসেবে উপস্থাপন করতে গিয়েই পুরাণের জন্ম। পুরাণ কোনো জাতি বা গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। পুরাণ সঙ্গে মিথের তুলনা করলে একটা জাতির সংস্কৃতির সঙ্গে একপ্রকার জড়িয়ে থাকে, এককথায় মিথ

মিথ একটি জাতির যূথবদ্ধ জিজ্ঞাসার উত্তর।

ভারতবর্ষের পুরাণ ধর্মমূলক আখ্যায়িকা। বাংলা বা ভারতীয় সাহিত্যে মিথের পরিভাষা হিসেবে পুরাণ শব্দটি প্রাধান্য লাভ করেছে। পাশ্চাত্য সাহিত্যে গ্রিক শব্দ 'মিউথোজ' যার অর্থ গল্প বা কিংবদন্তীর ভাষা, যা নির্যাস করলে দাঁড়ায়, "নির্দিষ্ট কোন জাতিগোষ্ঠীর অতিমানবীয় শক্তির প্রতি বিশ্বাস।" তাই মিথ প্রসঙ্গে বার্ণিক রায় বলেছেন — "প্রত্যেকটি সৃষ্টিই মিথ। আমরা যেমন মিথ সংগ্রহ করি তেমনি আমরা মিথ তৈরি করি এবং মিথের মধ্যে অজ্ঞাতে প্রবেশ করি।"[১] পুরাণ শব্দের সৃষ্টি পুরা+ণ যোগ 'ণ'অর্থ পূর্বে সংগঠিত হয়েছে এমন কিছুকে পুরাণ অর্থে ব্যবহার করা হয়। তাই পুরাণ শব্দটি বুৎপত্তিগত ধারায় বিশ্লেষণ করে বলা যেতে পারে পুরাতন লক্ষ্যে প্রযোজ্য।

পুরাণ ও মিথের মধ্যে যত পার্থক্য থাক, এই দুটিতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একটা সূক্ষ্ম সুদৃঢ় স্রোত রয়েছে যা মানুষের দ্বারা সৃষ্ট। 'রামায়ণ' এবং 'মহাভারত' — এতেও সুপ্রাচীনকালের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। যখন ভাষার লেখ্যরূপ সৃষ্টি হয়নি তখন থেকে পুরাণ লোকমুখে প্রচলিত ছিল, পরে লিপি আবিষ্কারের ফলে তা মুদ্রণাকারে স্থিতি লাভ করেছে। জনসমাজে পুরাণের আবেদন ব্যাপক বাঙালি জীবনে যেন এক সামাজিক মূল্যবোধের মাপকাঠি হয়ে ফুটে উঠেছে। আধুনিক সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী পুরাণকে নতুন আঙ্গিকে সাহিত্যের ভূমিতে এনেছেন যা নব সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে সমসাময়িক প্রেক্ষিতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পূর্ণনির্মিত চেহারাতে পাঠকমহলে তুলে ধরে। শুধু ভারতীয় পুরাণ নয়, অনেক সময় বিদেশি পুরাণও বাংলা সাহিত্যে সমৃদ্ধ লাভ করেছে। অতীত ও বর্তমান মিথস্ক্রিয়া পুরাকাহিনিকে সঞ্জীবনী সুধার মতো গড়ে তুলেছে। পৌরাণিক আখ্যায়িকাকে নতুন আবেগ, ভাব, মাধুর্যে তুলে ধরেছেন মহাশ্বেতা দেবী। তাঁর কিছু উপন্যাসে পুরাণ প্রসঙ্গ ফুটে উঠলেও ছোটোগল্পে মিথ বিশেষ উৎকর্ষ হয়ে ধরা দিয়েছে। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সামনে দিকে এগিয়ে যেতে গল্পের আবেদনগুলি মর্মস্পর্শী ও শিল্পগুণান্বিত হয়ে উঠেছে।

২

মহাশ্বেতা দেবী তাঁর ছোটোগল্পগুলিতে পুরাণের বিনির্মাণ বা নবনির্মাণ ঘটিয়েছেন। ধ্রুপদী পুরাণকে সরাসরি ব্যবহার না করে ইতিহাসের প্রেক্ষাপট অনুসন্ধান করে একটি কালচিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। বিনির্মাণ সব দেশের সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে ঘটে। বিনির্মাণ ধ্বংস নয়, নবরূপে উন্মেষ যা একটি বন্দিত প্রথার নবরূপায়ণ। 'চর্যাপদ'থেকে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে হাল আমলের কবি, সাহিত্যিক পর্যন্ত ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যকে অবলম্বন করে তা নবভাবনায় তুলে ধরেছেন বিনির্মাণের মধ্যে দিয়ে। পাশ্চাত্যে 'ডিকনস্ট্রাকশন' শব্দটি বাংলায় 'পুনঃনির্মাণ' অর্থে ব্যবহার হয়। লেখিকা ছোটোগল্পের বিষয় আখ্যানে নতুনত্বের ছোঁয়া দেখিয়েছেন। প্রচলিত শিল্পের গাঁথুনিকে দেশজ পুরাণ রসে জারিত না করে গল্পকে বক্তব্যমুখী করে তুলে মিথের আবহে ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে বিনির্মাণ ঘটিয়েছেন যাকে পাশ্চাত্য সাহিত্যে 'ডিকনস্ট্রাকশন' বলা হয়ে থাকে। তিনি কালজয়ী ছোটোগল্পে নিম্নবর্গীয় আদিবাসী সমাজের জীবন বৃত্তান্তের খুঁটিনাটি মূর্ত করেছেন পুরাণ চেতনার মধ্যে দিয়ে।

'সাঁঝ সকালের মা' একটি অসাধারণ সমাজ সচেতনতা মূলক ছোটোগল্প। এখানে বিলুপ্তপ্রায় পাখমারা সম্প্রদায়ের বিশেষ দিক দেখিয়েছেন। ভারতীয় জনজীবন ও মূলস্রোতের বাইরে থাকা সম্প্রদায়কে লেখিকা শক্তির বলে পুরাণের মাধ্যমে নতুন করে নির্মাণ করেছেন। পাখমারা যাযাবর জাতি, তারা পাখি ধরে বেচে বলে পাখমারা নামে খ্যাত। গল্পের শুরুতে দেখা যায়, বৈশাখ মাস জটি ঠাকুরানী মারা গেছেন। তিনি পাখমারা ব্যাধ গোষ্ঠীর মেয়ে, নিজস্ব গোষ্ঠীর বাইরে গিয়ে সরকারের খাতায় সংরক্ষিত মেদিনীপুরের উৎসব কন্দোরীকে প্রেমের পূর্বরাগে আসক্ত হয়ে বিবাহ করেন। কিন্তু বৈবাহিক জীবন তাঁদের সুখকর হয় না কারণ সমগোত্রের বাইরে তাঁদের বিবাহ নিষিদ্ধ। তাই তাঁরা পালিয়ে গিয়ে ঘর বাঁধেন এবং নিজস্ব পরিচয় মুছে ফেলার প্রবল ইচ্ছে তাঁদের মনে সজাগ হয়ে ওঠে।

"সব ছেড়ে পালিয়ে গেলে সরকারের কাছারিতে লিখে পড়ে জাত পাল্টালে তাহলে আর ওর মা-ঠাকুমা ওকে ধরতে ছুঁতে পারবে না।"[২] কিন্তু এই সুখী দাম্পত্য জীবন পাঁচ বছর স্থায়ী হয়। এই পাঁচ বছরের জীবনে তাদের কোল আলো করে শিশু জন্ম নেয়। এই সুখের মাঝেই নেমে আসে দুঃখ। একমাত্র সন্তান সাধনের মুখে প্রসাদের দিন উৎসব চোলাই মদ খেয়ে মারা যায়।

সদ্য স্বামীহারা জটি শিশু সন্তানকে নিয়ে পাখমারা সম্প্রদায়কে খুঁজে পেতে ব্যর্থ হন। তখন ক্ষুধা নিবারণের জন্য স্টেশনে ভিক্ষা করতে বসেন। তাঁর জীবনে নেমে আসে সংকট — সমাজের লোলুপ দৃষ্টি। নিজের সম্মান ও ছেলের প্রাণ বাঁচানোর জন্য ধর্মীয় ও অলৌকিকতার ধর্মে ভূষিত হয়ে জটি ঠাকুরানী গেরুয়া কাপড় আর ত্রিশূলকে সম্বল করে ওষুধ দেওয়া শুরু করেন এবং ভর হলে নিদান দেন। অল্পদিনেই খ্যাতিলাভ করে বিনিময়ে চাল নেন সবার কাছ থেকে। তবু তিরিশ বছর বয়স বুদ্ধিহীন সাধনের অস্বাভাবিক খিদে তিনি মেটাতে পারেন না। অবশেষে অনাহারে প্রাণ যায় জটির "সাঁঝে আর সকালে তু মা, আর দিন মানে তু ঠাকুরাণী। হ্যাঁ বাপো, আমি তোর সাঁঝ সকালের মা।"[৩]

লেখিকা পুরাণ ও মিথের অনুকরণে এই সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত সন্ধান করেছেন। পুরাণ পাঠে জানা যায় মহামুনি মহর্ষি দুর্বাসা তাঁর উচ্ছিষ্ট পায়েস কৃষ্ণকে দিয়ে বলেছিলেন কৃষ্ণের সর্বাঙ্গে সেই পায়েস লেপন করতে। কিন্তু কৃষ্ণ পদতল ব্যতীত সর্বস্থানে তা লেপন করেছিলেন। মুনির তা দৃষ্টিগোচর হওয়ায় তিনি বলেন, পদতলে আহত হয়ে তুমি প্রাণত্যাগ করবে। অন্যদিকে গান্ধারী শাপ দিয়েছিলেন মৃত্যুকালে কৃষ্ণ একাকী অরণ্যে থাকবেন। আর তাই সত্য হয়! মহাভারতে জরা নামে এক ব্যাধ ভ্রমে কৃষ্ণের পদতলে বাণ নিক্ষেপ করলেন এবং তাতে কৃষ্ণের প্রয়াণ ঘটে। ব্যাধ যখন তা বুঝতে পারেন তখন কৃষ্ণ ঊর্ধ্বলোকে যাত্রা করেছেন। গল্পে লেখিকা বলেছেন, "কুন দেশে য্যান সাগর, কুথায় য্যান দ্বারকাপুরী। জরা ব্যাধ সি দেশে যেঞে বাণ মারা করেছিল। কাকে কিষ্ণকে, পুথি পড় নাই।"[৪] ফলস্বরূপ এই সম্প্রদায় অভিশপ্ত হয়ে দ্বারকানগর ছেড়ে যাযাবর রূপে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে রাঢ় বঙ্গে আশ্রয় নেন। "ঈশ্বরকে যারা হত্যা করে গোড়ালিতে বাণ মারে তাদের বুঝি ঘুরে ঘুরেই জীবন শেষ করতে হয়।"[৫] তবে জটির জীবনে তা সম্পূর্ণ রূপে ধরা দেয়নি। তার স্বামী, সন্তান, সংসার ছিল কিন্তু কালের অমোঘ নিয়মে যাযাবর জীবনযাপন করতে হয়। প্রতিবন্ধী সন্তানকে বাঁচাতে 'সাঁঝ সকালের মা' হয়ে ওঠেন যার শেষ পরিণাম অনাহারে জটির মৃত্যু। এই গল্পে বিনির্মাণ জাতি ও পেশার মধ্যে দিয়ে ঘটে। গোষ্টীবদ্ধ জীবন এবং পাখি শিকারের বাইরে গিয়ে অন্য পেশা, ভিন্ন গোত্রে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া নিয়মের বেড়াজাল ছিন্ন করে স্বাধীনভাবে বাঁচাটাই জটির জীবনের কালস্বরূপ হয়ে ওঠে। যার ফলে তার অনাহারে মৃত্যু। ফলস্বরূপ সন্তান শেষ কৃতকর্মের চালটুকুও ভাত রান্না করে খায়। এতে নবনির্মাণ ঘটেছে জাতি আর নিম্নবর্ণের ক্ষুধা নিবারণের মধ্যে দিয়ে।

'পিণ্ডদান' গল্পটি পৌরাণিক আবেদন সমৃদ্ধ। কঙ্কাল ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত কিছু মানুষের চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে। প্রধান চরিত্র দশরথ মেডিকেল কলেজের ডোম, বেওয়ারিশ নামের কঙ্কাল বিক্রি করে। স্বপ্ন একদিন আস্ত পুত্র রামলালেরও খবর নেওয়ার প্রয়োজনটুকু বোধ করে না। সে জানে তাঁর ছেলে কোনো এক জেলে বন্দী, পিতার মৃত্যুর পরে অবশ্যই পিণ্ড দেবে। এদিকে দশরথ নিখুঁত কঙ্কাল খুঁজে পেতে অধীর। একদিন খবর পায় ঔষধ কোম্পানীর দিঘিতে আস্ত কঙ্কাল আছে। খুশিতে প্রাণ ভরে উঠে। কিন্ত পরক্ষণে খুশি মিলিয়ে যায় কারণ কঙ্কালের গলায় যে হার ছিল সেটা গড়েছিল ভবানীপুরের স্যাকরা গোপাল আর তাতে খোদাই করা ছিল 'রামলাল' যেটা সে তার পুত্রকে দিয়েছিল। সমাজের দুর্বিষহতার শিকার দশরথ। কঙ্কাল ব্যবসায়ী পালবাবুকে পুত্রের হাড়পাঁজরা বিক্রি করে একশ টাকা পাইয়ে দিলে দশরথকে তিনি কিছু টাকা দেন যা দিয়ে সে মদ, মাংস কিনে খায় আর বলে "চুপ যা মাগী ই মদ নয় আমারে আমি পিণ্ড দিছি! রাম মোরে আবার রাজা করে দিয়্যাছে, তুই জানবি কী? ক্যারেও বলতে দিব না দশরথ অপিণ্ডিয়া ছিল।"[৬] এই উক্তির মধ্যে কোথায় যেন বিধির বিধান অনুসারে পুত্রের হাতে মাতা পিতার পিণ্ড পাওয়ার একটা তীব্র বাসনা লুকিয়ে আছে যাতে আত্মা ভূতের দেহ বা দুঃখময় জীবন থেকে শান্তিলাভ করে।

রামচন্দ্র চোদ্দ বছর বনবাস জীবনযাপনে যাত্রা করলে পুত্র বিরহে দশরথের মৃত্যু হয়। তখন বনবাসী রাম বশিষ্ঠ মুনির নিকট পিতার প্রয়াণ সংবাদ লাভ করেন। তারপর চিত্রকূট পর্বতে ঋষিদের নিমন্ত্রণ করে ফল্গু নদীর তীরে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন। বনের বাসিন্দা হয়েও পুত্রের কর্তব্য থেকে বিরত থাকেন নি। কিন্তু মহাশ্বেতা দেবীর 'পিণ্ডদান' গল্পে দেখা যায় দশরথ পুত্রের বিষয়ে উদাসীন। শুধুমাত্র পিণ্ড পাওয়া তাঁর মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু কালের অমোঘ নিয়মে নিজের মৃত্যুর পূর্বে ছেলে রামলালকে কঙ্কাল হিসেবে পায়। সমস্ত আশা নিরাশায় পরিণত হয়। অন্ত্যজ জীবনকে কেন্দ্র করে গল্প রচিত হলেও পৌরাণিক পরিমণ্ডলে সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চালচিত্র তুলে ধরেছেন লেখিকা।

'সৌবলী' গল্পে ধৃতরাষ্ট্রের ঔরষে দাসীর গর্ভে যুযুৎসুর জন্ম হয় সেই সৌবলী নামে খ্যাত। সে রাজপ্রসাদে থাকে না নগরের প্রান্তে থাকে নিজেকে প্রান্তিক জনগোষ্টীর মানুষ ভাবে। পাঁচ বছর বয়সে মায়ের থেকে আলাদা হয়ে গুরুগৃহে চলে যায়।

সেখানে কৌরবদের সঙ্গে অস্ত্রশিক্ষার সময় তীর কুড়োত, শিকার করা পাখি উদ্ধার করত। ধৃতরাষ্ট্র, কুন্তী, গান্ধারী মৃত্যুর পর যুযুৎসুকে সামনে রেখে তর্পণ করা হয় কারণ একমাত্র সেই জীবিত ছিল "জীবনে কাছে যাইনি পিতা বলিনি — আজ তাঁরই তর্পণ করে এলাম।"[৭] দাসী পুত্র হয়েও বিদুরের সম্মান আছে। কিন্তু সৌবলীর তা নেই। তবু পুত্র হয়ে পিতার শেষ কৃতকর্ম করে সে। কিন্তু তাঁর মা করে না কারণ সে বিবাহিত নয় ধৃতরাষ্ট্রের জন্য বৈধব্য বেশ বা শেষ কৃতকর্মে নিযুক্ত হওয়াকে সে শ্রেয় মনে করে না। কারণ সে দাসী মাত্র। রাজার ঘরে এইরূপ স্ত্রীলোক অনেক থাকে যা তাঁর অজানা নয় তাই অশুচি পালন করে না। অন্তরের সমস্ত ক্ষোভ রাগ দুঃখকে উগরে দিয়ে বলে — "ক্ষীরের মোদক খাব, যবের ঘৃতপক্ক পিঠা, স্বর্ণ বর্ণ মধু খেয়ে ছেলের গায়ে হাত রেখে সুখে নিদ্রা যাব।"[৮] এই গল্পের মধ্যে দিয়ে সৌবলী চরিত্রে পুরাণের ব্যক্তিত্বকে টেনে এনে লেখিকা তাঁর লেখন বলে আধুনিক ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছেন। কৌরব রাজপ্রাসাদ থেকে অবহেলিত যুযুৎসু ও তাঁর মায়ের ইতিহাসকে নিজস্ব কল্পনার বলে মহাকাব্যের অনালোকিত অংশকে পুনঃনির্মাণ করেছেন এই গল্পটিতে।

'ভীষ্মের পিপাসা' গল্পটিতে এক দরিদ্র কৃষকের তৃষ্ণা নিবারণের জলের গল্প। ভীষ্ম গরানি বৃদ্ধ হয়েছে এখন। যৌবনে মন্ত্র বলে আকাশ থেকে বৃষ্টি নামাতেন কিন্ত এখন মন্ত্রপাঠ করতে পারেন না তাই বৃষ্টিহীন দগ্ধ জমি পড়ে থাকে। একমাত্র নাতি অর্জুন তাঁর মন্ত্র পড়ে বৃষ্টি নামার কথা বিশ্বাস করে না এতে ভীষ্ম কষ্ট পায়। বলে, "তুই কি জানবি অর্জুন? মোর মন্তরে দশ আকাশে ছেইয়ে মেঘ আসত। নবনের কি ডাক অর্জুন!"[৯] বিশ্বাস না করার কারণ মন্ত্রবলে দক্ষ ভীষ্মের নির্দেশিত স্থানে কূপ খনন করলে জল পাওয়া যায় না। আর এই খামখেয়ালির শিকার প্রত্যেক কৃষক, আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করে যারা ফসল ফলায় তাদের ফসল ভালো হয়। এখানে ক্ষমতার প্রতিপত্তি সঙ্গে রাজনীতির সূক্ষ্ম চাল অসহায় মানুষগুলিকে গ্রাস করেছে। মণ্ডলবাবুরা বড়ো বড়ো টিউবওয়েল দিয়ে সব জল টেনে নিয়েছেন। খাল, নদী, কূপ কোথাও নেই শুধু টিউবওয়েল সম্বল। যাদের টিউবওয়েল দিয়ে জল ওঠে না তাদের স্লোগান 'লাঙল যার জমি তার' ব্যর্থ হয় কারণ শুধু লাঙল দিয়ে চাষের কাজ হয় না জলের ও দরকার হয় — "ধূ ধূ মাঠ, শীর্ণ তৃষিত গাছের চারার মরূভূমির।"[১০] অসহায় ভীষ্ম মেঘকে, গঙ্গাকে ডাকে তাঁরা আসে কিন্তু অসময়ে, জলে ভরে মাঠ, ধানক্ষেত নষ্ট হয়। প্রাণ ভরে জল খেয়ে পিপাসা মেটায়। ভীষ্ম শেষে তৃষ্ণা নিবারণ করে সবুজ ক্ষেত দেখে প্রাণ ত্যাগ করে। মৃত্যুকালে স্বপ্ন দেখে — "সব চাষি জল নিচ্ছে ভীষ্মের মেঘ থেকে। সমস্ত ধানক্ষেত শস্যে ভরে গেল। খেত সুপ্রসবিনী হয়! ভীষ্মের কথা শোনে ধান লাও হে মানুষেরা ধান লাও।"[১১] 'ভীষ্ম'চরিত্রের মধ্যে দিয়ে পৌরাণিক অনুষঙ্গকে নবরূপে ফুটিয়ে তুলেছেন গল্পকার। মহাভারতে ভীষ্ম কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে টানা নয়দিন যুদ্ধ করেন। তাঁকে বধ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় শ্রান্ত হয়ে তাঁর থেকেই পরাস্ত হওয়ার মন্ত্র শোনে পাণ্ডবগণ। ক্লীব, মেয়ে, বা মেয়ের গর্ভ থেকে জন্ম হওয়া কোনো ছেলের সঙ্গে যুদ্ধ করে না সে। ফলত কৌশল করে পাণ্ডবগণ অর্জুনকে শিখণ্ডী হিসেবে দাঁড় করায় তখন তীর নিক্ষেপিত হয়ে ভূমিতে পতিত হন তবু মৃত্তিকা তাঁকে স্পর্শ করে না। মাথা ঝুলতে থাকে; অর্জুন তিনটি বাণ মেরে শরের বালিশ তৈরি করে শরশয্যায় শুইয়ে দেয়। সূর্য তখন উত্তরায়ণ জন্য ভীষ্ম বেঁচে থাকে, দক্ষিণায়ণ হলে প্রয়াণ ঘটবে, কিন্তু শেষ ইচ্ছে তৃষ্ণা নিবারণ। সেইজন্য অর্জুন ভৌমাস্ত্র নিক্ষেপ করে পাতালগর্ভ থেকে জল তুলে পিপাসা নিবৃত্তি করলে পরলোকগমন করেন। গল্পে ভীষ্মের তৃষ্ণা নিবারণে ব্যর্থ অর্জুন। অর্জুন ও ভীষ্মের চরিত্র নবরূপে ধরা দিয়েছে এই গল্পে। পুরাণে ভীষ্মের জল পান করানোর জন্য অর্জুন ব্যাকুল কিন্তু গল্পে তৃষ্ণা মেটাতেই সে পারেনা। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির কাছে মন্ত্রবল ব্যর্থ হয়ে যায়। কালের অমোঘ নিয়মে বৃষ্টি আসে অসময়ে তা ভয়াল রূপ নেয়। লেখিকা গল্পে চরিত্রের মধ্যে দিয়ে পুরাণের নবরূপ তুলে ধরেছন।

'রাবণ' গল্পে সংকেত বিচারে পুরাণ এসেছে। এটি স্বাধীনতার পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ রাজনীতির প্রেক্ষাপটে লেখা। কৃষক আন্দোলনকে ভিত্তি করে বামপন্থীরা ক্ষমতায় আসে, আইন করে ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে কৃষকদের প্রাপ্য জমি ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু রাজনীতিতে সব সম্ভব তাই পুনরায় জোতদাররা দল পরিবর্তন করে বামপন্থায় যোগ দেয় আর কৃষকদের বহু জমি হাত ছাড়া হতে থাকে ভূমি মাফিয়াদের জন্য। মার্কসবাদে বিশ্বাস রেখে কৃষক সভার সঙ্গে যুক্ত হয় ভরত গলসি। তাঁর লড়াই ছিল স্থানীয় জোতদার জনক চাকুলার সঙ্গে, পরবর্তী সময়ে চাকুলা শোষিত দলে যোগদান করে ভরতের জমি পুনরায় দখল করে আর তিন পুত্রকে মিথ্যা অভিযোগে গ্রাম ছাড়া করায়। ভরতের পুত্রবধূ ও নাতনীকে হত্যা করে চাকুলার আর সেই দোষ কেতন পুত্রের উপরে চাপায়, গ্রেফতার হয় সে। ছাড়া পেয়ে পিতার সঙ্গে দেখা করে। ফেরার পথে দশেরা উৎসব উপলক্ষ্যে রাবণ মূর্তি প্রস্তুত করা দেখে আর সেই মূর্তিতে আগুন দেবার সময় জনকের চালে আগুন পড়ে তার বাড়ি পুড়ে যায়।

কেতনের খড়ে রাবণ পুড়িয়ে দেওয়া এক অন্যায় সমাজ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার ইঙ্গিত। 'রামায়ণ'এ রাবণ অন্যতম খলচরিত্র, তিনি লঙ্কাধিপতি। রামচন্দ্রের পত্নী সীতাকে হরণ করে লঙ্কাদ্বীপে আটকে রাখে ফলস্বরূপ রামচন্দ্র লঙ্কাদহন ও সীতাকে উদ্ধার। দশেরা হলো দেবীপক্ষের দশম দিন এইদিন লঙ্কারাজ দশাননকে রাম যুদ্ধে পরাজিত করে সীতাকে মুক্ত করে। স্থানীয় ভাষায় একে 'দশহরা' বলে যার অর্থ 'দশ' মানে দশানন বা রাবণ আর 'হরা' মানে হার। এই উৎসবের মূল উদ্দেশ্য অশুভ শক্তির বিনাশ শুভ শক্তির সূচনা। আর এই গল্পের নামকরণে আছে রামায়ণের স্পর্শ আর গল্পের পটভূমিতে রাবণরূপী জোতদারকে প্রতিকায়িত করা হয়েছে। জনক চাকুলার মতো রাবণ চরিত্রের চিত্রাঙ্কন করে লেখিকা পুরাণের নবরূপ ঘটিয়েছেন।

'বাঁয়েন' গল্পটি এক নিম্নবর্গ ডোম পরিবারের কাহিনি যার পেছনে লুকিয়ে আছে ডোম সমাজের অন্ধকুসংস্কার আচ্ছন্ন বাঁয়েন প্রথা। গল্পের মূল থিম আবর্তিত হয়েছে 'চণ্ডী' নামক এক নারী চরিত্রকে কেন্দ্র করে যা সমাজ সচেতন মনে বাস্তবতার পরিপন্থী। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে আমরা প্রায়শই সংবাদপত্রে লক্ষ করি নারীকে ডাইনি অপবাদ দিয়ে হত্যা বা অত্যাচার। ডোম চণ্ডী বিয়ে করে নিজস্ব গ্রামের মলিন্দর গঙ্গাপুত্রকে, সুখের সংসার তাঁদের। মলিন্দর সরকারি লাশ ঘরের ডোম আর চণ্ডী পিতার কৌলিক বৃত্তি সূত্রে ভাগাড়ে শবদেহ সৎকার করে। তাদের একমাত্র পুত্র ভগীরথের জন্মের পর চণ্ডীর জীবনে নেমে আসে বিপর্যয়, সে বাঁয়েন হয়ে ওঠে। "বাঁয়েন যখন যায় তখন টিন বাজিয়ে সাড়া দিতে দিতে যায়। বাঁয়েন যদি কোন ছেলে বা যুবা পুরুষকে দেখে তখনি চোখের দৃষ্টিতে তাদের শরীর থেকে রক্ত শুষে নিতে পারে।"[১২] চণ্ডীর ননদের মেয়ে যখন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় এবং একদিন ঝড় জলের রাতে একটি শিশুর মৃতদেহ ডাল, কাঁটা থেকে বের করতে গিয়ে তাঁর বুকের দুধ মাটিতে গড়িয়ে পড়ে যায় তখন গ্রামবাসীদের মতো তাঁর স্বামীও তা দেখে 'বাঁয়েন' রূপে ভূষিত করে। "ঢোলে কাঠি দিয়ে গ্রাম কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল আমি মলিন্দর গঙ্গাপুত্র শোহরৎ দেই। আমার বউ বাঁয়েন হয়্যাছে।" ডোম সমাজ যখন চণ্ডীকে বাঁয়েন বলে আবিষ্কার করে তখন সংসারে অশান্তির খড়্গ নেমে আসে। কাছের মানুষদের পরিচয় দিতেও[১৩] মানা করা হয়। ছেলে ভগীরথ বড়ো হলে গল্পের মোড় বদল হয়। মায়ের পরিচয় জানতে চায় সে। আর নিজের এই পরিচয় দিতে না পেরে সে লজ্জিতবোধ করে বারবার আর্তনাদ করতে থাকে। শেষে নিজের পরিচয় ফিরে পেতে জীবন বাজি রেখে "লণ্ঠন হাতে চণ্ডী লাইন ধরে ছুটতে লাগল, এক হাত তুলে মানা করতে লাগল, এসো না আর এসো না গো, এখানে পাহাড় প্রমাণ বাঁশ গাঁড়া।"[১৪] যে সমাজ তাকে লাঞ্ছনা, যন্ত্রণার কশাঘাতে জর্জরিত করেছে সেই মানববোধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে ধরা দিয়েছে। এক গভীর রাতে চণ্ডী দেখে ওয়াগরো রেললাইন অবরোধ করেছেন যাতে হতে পারে বড় বিপদ প্রাণ যেতে পারে সহস্র মানুষের। তখন নিজের জীবন বিপন্ন করে সবাইকে বাঁচায় আর ট্রেনের ধাক্কায় মারা যায়। চণ্ডীর এই আত্মবলিদান কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মভীরু মানুষগুলোকে জাগিয়ে তুলবার অন্বেষণ। সমাজের কুপ্রথার বিরুদ্ধে যুক্তিগ্রাহ্য পটভূমি এইভাবে হয়ত সমাজের ধারণা বদলে দেয়।

'বাঁয়েন' গল্পে সেইভাবে পুরাণ না থাকলেও চরিত্রের নামাঙ্কনে গল্পের বাঁকে তা স্মরণ করা যায়। 'চণ্ডী' অনার্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের দেবী। রক্তবীজ দৈত্যকে বধ করতে মা কালীকে সাহায্য করেছিলেন। কারণ তাঁর রক্ত ভূপতিত হলে অসংখ্য রক্তবীজ জন্ম নেবে এতে মানবলোক অসুরে পরিণত হবে ধ্বংস হবে সৃষ্টির। গল্পে 'চণ্ডী' চরিত্রটি পুরাণের চণ্ডীর নবনির্মিত রূপ।

গল্পকার অন্ত্যজ ও আদিবাসী নারীদের জীবনের সারকথা বারবার নতুন আঙ্গিকে তুলে ধরেন লেখনিকলার মধ্য দিয়ে। 'দ্রৌপদী' গল্পটি তেমন একটি গল্প। সভ্য জগৎ আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের কীভাবে শোষণ করে তার একটি দিক ফুটে উঠেছে। দ্রৌপদী মহাভারতের চরিত্র, কিন্তু গল্পে এই নারী চরিত্র সাতাশ বছর বয়সী। তাঁর স্বামী দুলাল মাঝি পুলিশের গুলিতে আহত হয়। ১৯৭১ সালে অর্জুন সিং ও পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে দম্পতি ছদ্মনাম নেয় উপী মেঝেন, মাতং মাঝি। পরে স্বজাতি দুখীরাম ঘড়ামীর বিশ্বাসঘাতকতায় স্বামী দুলালের প্রাণ যায়। তাদের সহকারী যাদের লড়াইয়ের মূলমন্ত্র ছিল নিজস্ব প্রাপ্য বুঝে নেওয়া, শেষে লোভের বশবর্তী হয়ে সোমাই ও বুধনার বিশ্বাসঘাতকতায় দ্রৌপদীকে পুলিশ জালে আবদ্ধ করতে সক্ষম হয়। তারপর গল্প নতুন বাঁক নেয়। সেনানায়কের নির্দেশে শুরু হয় দ্রৌপদীর উপরে অত্যাচার, অমানবিক ও অমানসিক যৌন নির্যাতন। সেনানায়ক রাত্রিকালীন আহার শেষ করে অন্যান্য সেনানায়কদের নির্দেশ করে "ওকে বানিয়ে নিয়ে এসো, ডু দি নিডফুল।"[১৫] সদস্যরা সাধ্যমতো তাঁকে বানায়। "শুধু মুখের ভেতর কাপড়, ভীষণ তেষ্টা পাচ্ছে, জল বলে ওঠে। — বুঝতে পারে যোনিদ্বারে রক্তস্রাব, কতজনকে বানিয়ে নিতে এসেছিল? — ঘোলাটে চাঁদের আলোয় বিবর্ণ চোখ নীচের দিকে নামাতে নিজের স্তন দুটি চোখে পড়ে এবং ও বোঝে, হ্যাঁ ওকে ঠিক মতো বানানো হয়েছে। এবার ওকে সেনানায়কের পছন্দ হবে। স্তন দুটি কামড়ে ক্ষতবিক্ষত, বৃন্ত ছিন্নভিন্ন। চার-পাঁচ-ছয়-

সাত তারপর দ্রৌপদীর হুঁশ ছিল না।"[১৬]

সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকেই নারীকে পুরুষের লোলুপতার শিকার হতে হয়। ভারতীয় পুরাণ সেই ইঙ্গিত বহন করে। মহাভারতের উল্লেখযোগ্য একটি নারী চরিত্র দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবের স্ত্রী যাকে পাণ্ডবগণ পাশা খেলায় কৌরবদের কাছে বাজি রাখে। শেষে যখন হেরে যায় তখন দুঃশাসন ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভায় তাঁকে বিবস্ত্র করতে উদ্যত হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দয়ায় নারীর প্রধান ভূষণ লজ্জা, ইজ্জতের হাত থেকে সে মুক্তি লাভ করে। এই গল্পে পুরাণের নবনির্মিতি ঘটেছে দ্রৌপদী চরিত্রের মধ্যে দিয়ে। সে শুধু নাম নয় একটা বিদ্রোহীসত্তা জোতদার-মহাজনী শোষক সমাজের বিরুদ্ধে বীরাঙ্গনা আদিবাসী পার্থিবরূপ। এক ঘন্টা ধরে যাকে অমানবিক যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণ করা হয় তবু তার বিরোধীসত্তা ক্ষান্ত হয়নি বরং জাগ্রত হয়ে উঠেছে। উলঙ্গ অবস্থায় বীভৎস রূপ নিয়ে এগিয়ে আসে: "দ্রৌপদীর কালো শরীর আরো কাছে আসে।... হাসতে গিয়ে ওর বিক্ষত ঠোঁট দিয়ে রক্ত ঝরে এবং সে রক্ত হাতের চেটোতে মুছে ফেলে দ্রৌপদী... তীক্ষ্ম গলায় বলে, কাপড় কি হবে কাপড়? লেংটা করতে পারিস, কাপড় পরাবি কেমন করে? মরদ তু?"[১৭] দ্রৌপদী নির্যাতিত নয় সে অনার্য দেবী কালীর রূপ। সাঁওতাল রমণীর মাধ্যমে গল্পকার নগ্নতা ও সামাজিক সমীকরণের এক উন্মেষ ঘটিয়েছেন। দ্রৌপদী রক্তমাখা থুতু সেনানায়কের সাদা শার্টে ফেলতে থাকে। সাধারণ অন্ত্যজ শ্রেণির রমণী হয়েও খোলস ত্যাগ করে হয়ে ওঠে পরমেশ্বরী। এই অবস্থার বর্ণনা লেখিকা দিয়েছেন এভাবে — "হেথায় কোন পুরুষ নাই যে লাজ করব। কাপড় মোরে পরতে দিব না। আর কি করব? লো কাঁউটার কর, লো কাঁউটার কর — দ্রৌপদী দুই মর্দিত স্তনে সেনানায়ককে ঠেলতে থাকে এবং এই প্রথম সেনানায়ক নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পায়, ভীষণ ভয়।"[১৮] সমাজ-ইতিহাস ও পুরাণ কথার স্ফুরণে মিথের সৃষ্টি হয় যা 'দ্রৌপদী' গল্পে যথার্থ রূপে নবপুরাণ সৃষ্টি হয়েছে। গল্পের নামকরণে পৌরাণিক ছাপ থাকলেও কাহিনির বিন্যাসে আধুনিক সমাজের নিপীড়িত ইতিহাসের পদচারণা।

গল্পকার পুরাণের নবনির্মিতি ঘটিয়েছেন প্রধান চরিত্র দ্রৌপদীর মধ্য দিয়ে। নিম্নবর্গের মেয়েরা সাধারণত ভয় পায় জাতিচ্যুত হওয়ার। কিন্তু সে সবকিছু উপেক্ষা করে এগিয়ে গেছে নিজের উপরে ঘটা অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছে। গল্পের দ্রৌপদী শুধু একা নারী নয় সে প্রতিটি নারীর এক একটি প্রতিরূপ যারা প্রতিনিয়ত পুরুষ শাসিত সমাজের লোলুপতার শিকার। যেসব নারী ভয়কে পাথেয় করে বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াতে লজ্জা পায় দ্রৌপদী যেন তাদের মাইলফলক হয়ে ধরা দিয়েছে আর এখানেই গল্প নতুন ছাঁচ পেয়েছে।

পুরাণকে ইঙ্গিতার্থে মহাশ্বেতা দেবী বিভিন্ন ছোটোগল্পে ব্যবহার করেছেন তেমন একটি গল্প 'ঊর্বশী ও জনি'। গল্পে বিষয়গত ও উপস্থাপনগত ভাবে অন্যন নজির, আপাত রহস্য ধূপছায়া প্লটে পৌরাণিক সঞ্চার ঘটিয়েছে। ভারতবর্ষে বহু পেশার লোক রয়েছে। প্রধান চরিত্র জনি 'ভেন্ট্রিলো কুইস্ট' অনাথ বড়ো হয় আশ্রমে। আশ্রম থেকে পালিয়ে সিনেমার টিকিট বিক্রি করে। তার উপলব্ধি হয় মানুষ দুবেলা দুমুঠো না খেতে পেয়েও সুখে থাকতে চায় তাই যারা টিকিট কেটে সিনেমা দেখতে পারে না তাদের জন্য গান বাঁধে। কিন্তু নিয়তির লেখনে তার গলায় ক্যান্সার ধরা পড়ে। হাসপাতালের ডাক্তার সাফ জানিয়ে দেয় এই রোগের চিকিৎসা নেই। জনির সর্বক্ষণের সঙ্গী ঊর্বশী পূর্ণ যুবতী পুতুল "ঊর্বশীর নির্লিপ্ত ভুবনমোহিনী অপরূপা পিনন্ধ বুক, লাল ঠোঁট চোখ স্থিতি।"[১৯] ঊর্বশী জনির আত্মা তারা সুখে ঘর বাঁধতে চায়। জনি ঊর্বশী সম্পর্কে মিশে যায় পুতুল খেলা দেখাবার পেশা, শিল্প, প্রেম ও যৌন বাসনা। গল্পের শেষে জনি বাকরুদ্ধ হয়ে যায় কিন্ত এই দুঃখ থেকে তার বড়ো দুঃখ ঊর্বশী কথা বলতে পারে না। কারণ জনি ঠোঁট না খুলে ঊর্বশীর আওয়াজ বের করত আর তখন সে গান গাইত। শেষে মর্মান্তিক পরিণতি হয় তার প্রাণপ্রিয় পুতুল ভেঙে ফেলে।

ইন্দ্রসভায় নৃত্যকালে আহূত পুরুরবার ঊর্বশী রূপে মুগ্ধ হয়ে দৃষ্টিপাত দিলে তালের ছন্দপতন ঘটে তখন ইন্দ্রের শাপে মর্তলোকবাসী হয়। পৃথিবীতে ভূমিষ্ট হয়ে ঊর্বশী পুরুরবাকে বিয়ে করে কিন্তু শর্ত হলো দিনে তিনবার স্বামী তাকে আলিঙ্গান করতে পারবে আর স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক শয্যায় শয়ন করতে পারবে না; আর পুরুরবাকে যেন কোনোদিন নগ্ন অবস্থায় না দেখে। কিন্তু নিয়তির কালচক্রে একদিন তাকে বিবস্ত্র দর্শন করে আর তার শাপমুক্তি ঘটে। গল্পেও পুতুল ঊর্বশী রূপে সকলে মোহিত পাওয়ার ব্যাকুলতা। জনিও সমস্ত প্রেম, ভালোবাসা ঊর্বশী মধ্যে খুঁজে পেতে চাইত। প্রতিকার্থে বিলুপ্তপ্রায় শিল্পকলাকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে পুরাণের অবতারণা করা হয়েছে।

'সন্ধ্যাভাষা' গল্পে আবহমান কাল ধরে চলে আসা নারীদের উপর অত্যাচারের কথা ব্যক্ত হয়েছে। পণ প্রথাকে কেন্দ্র করে

এই গল্প রচিত। মূল চরিত্র গৌরী পিতৃহারা মা তাকে বিয়ে দিতে সমস্ত জমিবাড়ি বিক্রি করেছে তবুও পাত্র পক্ষের চাহিদা মেটেনি। ক্ষিপ্ত হয়ে বরপক্ষ গৌরীর যৌনাঙ্গে অ্যাসিড ছুঁড়ে মারে। অর্ধমৃত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। প্রাণে বেঁচে যায়। কিন্তু পিতৃতুল্য কাকাও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অবশেষে ভাগ্যে জোটে সামাজিক লাঞ্ছনা, আশ্রয় নিতে হয় গ্রামের হর নামক একব্যক্তির ছত্রছায়ায়। সেই হর তাকে লিঙ্গ সাম্য নয় একজন মানুষ হিসেবে তাকে বাঁচিয়ে রাখার প্রতিশ্রুতি দেয় আর নিয়ে চলে যায় "মাথা উঁচু করে চলে যায় দুই নর-নারী।"[২০] গল্পের মূলচরিত্র হর এবং গৌরী। নামের মধ্যে দিয়ে লেখিকা পৌরাণিক আবেদনে মানবিকতার সম্পর্ক ফুটিয়ে তুলেছেন। 'হর' পৌরাণিক শিব আর 'গৌরী' স্ত্রী পার্বতী। শিবকে অর্ধনারীশ্বর বলা হয়। তিনি একঅঙ্গে পার্বতীকে ধারণ করেন তাই তাঁদের যুগলকে হর-গৌরী বলে। এঁদের প্রেম ভারতীয় সংস্কৃতির শাশ্বত প্রেমের স্মারক। যখন অ্যাসিড আক্রান্ত, পণ প্রথার শিকার অসহায় মেয়ের থেকে সমাজ, পরিবার মুখ ফিরিয়ে নেয় তখন হর তাকে নতুন জীবনের পূর্ণতা দান করে। পুরাণ এখানে প্রেমের নজির স্থাপন করেছে। তেমনি গৌরী চরিত্রের মধ্য দিয়ে পণ চাহিদা শিকার ভারতীয় নারী জীবনচিত্র লেখিকা ফুটিয়ে তুলেছেন।

মাতৃ মূর্তি নির্মাণ ও ভারতীয় সমাজে মাতৃত্বের অবস্থান নিয়ে গল্পকার 'স্তনদায়িনী' গল্পটি লিখেছেন। জৈবিক মাতৃত্ব ও মানবিক মাতৃত্বের মেলবন্ধন ঘটেছে যশোদা চরিত্রে। সে প্রফেশনাল মাদার বা মাতৃত্বকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে। স্বামী কাঙালির দুর্ঘটনায় হারান ও কুড়ি সন্তানের মুখে ভাত তুলে দিতে এই পথ বেছে নেয়। "যশোদা একেবারে ভারতীয় রমণী, যে রমণীর যুক্তিবুদ্ধি — বিচারহীন স্বামীভক্তি ও সন্তান প্রেমের কথা, অস্বাভাবিক ত্যাগ — তিতিক্ষার কথা, সতী সাবিত্রী সীতা থেকে শুরু করে নিরূপা রায় ও চাঁদ ওসমানি পর্যন্ত সকল ভারতীয় নারী জনমানসে জাগিয়ে রেখেছেন।"[২১] হালদারবাড়ির সন্তানদের যশোদা অর্থের বিনিময়ে স্তনদান করে আর সেই স্তন যোগানদার জন্য অবিরত রাখতে হয় সন্তানগর্ভে। স্বামী কাঙালি বলে "তুই সতীলক্ষ্মী নিজে পোয়াতি হবি, পেটে ছেলে ধরবি, বুকে পালন করবি ও জেনেই মা তোকে ধাইবেশে পাঠিয়েছে।"[২২]

অবশেষে যখন তার গর্ভধারণ ক্ষমতা ও দুগ্ধক্রেতাদের প্রয়োজন কমে যায় তখন হালদার বাড়ির লোক, স্বামী তাকে অপাংক্তেয় ভাবে। ভারতীয় সমাজ যেমনভাবে গোমাতাদের সেবা করে যতদিন তাদের দুগ্ধপ্রদান ক্ষমতা থাকে ততদিন ঘরে রাখা হয় আর অক্ষম হয়ে গেলে কসাইখানায় প্রেরণ করা হয়। যশোদারও সেই দশা; অতিরিক্ত স্তনদানে যখন ক্যান্সার আক্রান্ত হয় অসহ্য যন্ত্রনায় কষ্ট পেয়ে বিনা চিকিৎসায় হাসপাতালে মারা যায়। মৃত্যুসজ্জায় গর্ভজাত সন্তান ও স্তনপান করিয়ে যাদের মানুষ করেছে তাদের সান্নিধ্য লাভ করতে চায় কিন্ত পায় না। গল্পকার তাই ব্যঙ্গ করে বলেন, "ভারতীয় মাটির গুণ এমনি, যে এখানে রমণীরা সবাই জননী হয়ে যায় এবং পুরুষরা সবাই গোপাল ভাবে আপ্লুত হতে থাকে।"[২৩] ভারতীয় পুরাণে কৃষ্ণের পালিত মাতা যশোদা। কংসের হাত থেকে বাঁচার জন্য দৈবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তানকে নিজের সন্তান ভেবে মানুষ করে কিন্ত সে শেষে তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। তাই পুরাণের যশোদা আর গল্পের যশোদা একই সত্তা ঈশ্বর স্বরূপিণী "এ সংসারে মানুষ ঈশ্বর সেজে বসলে তাকে সকলে ত্যাগ করে এবং তাকে সতত একলা মরতে হয়।"[২৪]

'স্তনদায়িনী' গল্পে যশোদা বুকের দুধ খাইয়ে শিশুদের পালন করে নাম হয় 'দুধ মা'। সেখানে গর্ভধারিণী মা চারিত্রিক সৌন্দর্যের জন্য ইনজেকশন নিয়ে মাতৃদুগ্ধ বন্ধ করে। আর দুধ-মা সেই স্তনপানকে জীবিকা হিসেবে নিয়েছে। বর্তমান প্রযুক্তির যুগে বহু মহিলা জরায়ু বা গর্ভ ভাড়া দেয় এবং অন্য সন্তান জন্ম দিয়ে (সারোগেট মাদার) রোজগার করে। লেখিকা এইরকম পেশা উদ্ভাবনা করে গল্পের মধ্যে চরিত্রের মেলবন্ধনে পুরাণকে নবরূপ দান করেছেন।

'কমলালয়' নামটি কেন্দ্র করে পুরাণ ফুটে উঠেছে। কমলা লোকের বাড়িতে কাজ করে পেশায় ঝি। জীবনে কোনো উচ্চাশা নেই সন্তান উৎপাদন করাই তার একমাত্র আশা। কমলা চরিত্রে উচ্চবর্গ নারীর বৈপরীত্য দেখিয়েছেন লেখিকা। কমলার সাত ছেলে মেয়ে বিশ্বাস শেষ জীবনে দেখে রাখার বা কামিয়ে খাওয়ার লোকের অভাব হবে না। বড়বাবুদের একটি করে সন্তান এতে নারী হয়ে মাতৃত্বের স্বাদ পূর্ণ হয় না। তাদের একটি মাত্র সন্তান আদরে যত্নে মানুষ করা সত্বেও অন্তিম সময়ে দেখে না। কমলার এই উপলব্ধি আমাদের প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। অশিক্ষিত কমলার এজাতীয় মতাদর্শন শিক্ষিত সমাজকে বাস্তবের সম্মুখীন করে। কমলা হিন্দু দেবী লক্ষ্মী যিনি ধন, ঐশ্বর্যের প্রতীক। স্বামী নারায়ণকে নিয়ে সুখে সংসার করেন। কিন্তু গল্পের কমলা লোকের বাড়িতে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে দাসীর মতো জীবনযাপন করে। কমলালয় ও কমলা নামের মাধ্যমে প্রতীকি অর্থে পুরাণ এসেছে।

বাংলা সাহিত্যে মিথের ব্যবহার প্রথম ঘটে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে। তারপর তুর্কি আক্রমণের জটিল আবহাওয়াকে ছাপিয়ে উঠে বাঙালি নতুনভাবে জাগিয়ে তোলে অনুবাদ সাহিত্যকে যা এক অর্থে বিনির্মাণ। এইভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে পুরাণের নবজন্ম ঘটে, তা পরবর্তী সময়ে শ্রীরামপুর মিশন, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হাত ধরে পুরাণকে মনুষ্যজগতে গ্রহণযোগ্য করা শুরু হয় আর তার প্রাণপুরুষ হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এরপর বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র'র হাত ধরে পুরাণ শক্ত ভিটে পায়। মধুসূদন দত্ত, নবীনচন্দ্র সেন, পরশুরাম, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো ব্যক্তিত্বরা পুরাণের নবগঠন ঘটিয়েছেন।

আধুনিক যুগের পৌরাণিক আখ্যায়িকাকে যাঁরা নতুন আবেগ, ভাব মাধুর্যে নবরূপ দিয়েছেন সেই ধারার অন্যতম পথিকৃৎ মহাশ্বেতা দেবী। তিনি পুরাণকে নব উৎকর্ষ দান করেছেন। ছোটোগল্পকার হিসেবে উদ্ভব পর্বে তিনি গতানুগতিক ধারার গল্প লিখলেও ১৯৬০ সালের পর থেকে 'Art for art sake' নয় বরং 'Art for man sake' ভাবনাতে গল্প লিখতে শুরু করেন। সৃষ্টির প্রাক্ লগ্ন থেকে জীবজগতে নানা কাহিনি বিবর্তনের মাধ্যমে অগ্রসর হয়। আর সেই কাহিনি আশ্রয় করে গড়ে ওঠে লোকবিশ্বাস। পুরাণ কথার বিনির্মাণ ও সমাজ চিত্রের মধ্য দিয়ে উপজাতিভুক্ত অসহায়, অবহেলিত মানুষ যারা সভ্য সমাজের কাছে অচ্ছুত তাদের মনের কথা ব্যক্ত হয়েছে। আর সেই অসহায়দের কাছে লেখিকা 'মারাং দাই' যার বাংলা পরিভাষিক অর্থ 'মা' হয়ে উঠেছেন। সাহিত্যের ক্যানভাসে সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষদের জীবন্ত করে তোলার জন্যই পুরাণকথার আশ্রয় নিয়েছেন ও চরিত্রগুলিকে নিজস্ব শক্তির বলে বলীয়ান করে তুলেছেন। সমাজের মূলধারার জীবনশৈলী আচার আচরণ বটছায়া থেকে যারা বঞ্চিত তাদের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনবার প্রয়াস তাঁর ছোটোগল্প। এখানেই একজন ছোটোগল্পকার হিসেবে তাঁর অন্যনতা ও সার্থকতা।

তথ্য সূত্র:

১। 'কবিতায় মিথ', বার্ণিক রায়, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ১৪
২। 'শ্রেষ্ঠ গল্প', মহাশ্বেতা দেবী, দে'জ পাবিলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, মার্চ ২০১৯, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৩৯
৩। ওই, পৃ. ১২
৪। ওই, পৃ. ১৩
৫। ওই, পৃ. ২২
৬। ওই, পৃ. ৪৯
৭। 'মহাশ্বেতা দেবীর পঞ্চাশটি গল্প', মহাশ্বেতা দেবী, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০১ জুন, কলকাতা ৭০০০০৬, পৃ. ১৪০
৮। ওই, পৃ. ২৪
৯। ওই, পৃ.৬৪
১০। ওই ,পৃ. ৬৬
১১। 'শ্রেষ্ঠ গল্প', মহাশ্বেতা দেবী, দে'জ পাবিলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, মার্চ ২০১৯, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ.৩৯
১২। ওই, পৃ. ৪২
১৩। ওই, পৃ. ৪৩
১৪। ওই, পৃ. ৪
১৫। ওই, পৃ. ৬৯
১৬। ওই, পৃ. ৭০
১৭। ওই, পৃ. ৭১
১৮। ওই , পৃ. ৭১
১৯। 'মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সঙ্কলন', মহাশ্বেতা দেবী, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, জুন ২০০০৪, পৃ. ২৫
২০। ওই, পৃ. ২৬
২১। 'শ্রেষ্ঠ গল্প', মহাশ্বেতা দেবী, দে'জ পাবিলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, মার্চ ২০১৯, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ.৮২
২২। ওই, পৃ. ৮৩
২৩। ওই, পৃ. ৮৮

২৪। ওই , পৃ. ১০০

আকর গ্রন্থ:

১। মহাশ্বেতা দেবী, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', দে'জ পাবিলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, মার্চ ২০১৯, কলকাতা ৭০০০৭৩

২। মহাশ্বেতা দেবী, 'মহাশ্বেতা দেবীর পঞ্চাশটি গল্প', প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন, প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৬, মার্চ ২০০১

৩। মহাশ্বেতা দেবী, 'মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সঙ্কলন', ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া, জুন ২০০০৪

সহায়ক গ্রন্থ:

১। বার্ণিক রায়, 'কবিতায় মিথ', পুস্তক বিপণি ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ, কলকাতা ৭০০০০৯

২। চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত, 'মিথ-পুরাণের ভাঙাগড়া', পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, জানুআরি ২০১৫, কলকাতা ৭০০০০৯

৩। সুধীরচন্দ্র সরকার, 'পৌরাণিক অভিধান', এম সি সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৌষ ১৪১২, কলকাতা ৭০০০১২

৪। তপোধীর ভট্টাচার্য, 'ছোটগল্প বিনির্মাণ', অঞ্জলি পাবলিশার্স, ১৪ রামানাথ মজুমদার স্ট্রিট, জুলাই ২০০৬, কলকাতা ৭০০০৭৩

লেখক পরিচিতি: শ্রেয়া তালুকদার, পিএইচ.ডি গবেষিকা, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পশ্চিমবঙ্গ